মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ–রুখতে হবে কীভাবে।

মোঃ জানে আলম

... ইসলাম ধর্মে ইহুদী নাসেরাদের সাথে বন্ধুত্ব পর্যন্ত করতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সে কারণে একজন সত্যিকার ধার্মিকের অন্য ধর্মকে সহ্য করা– তাকে মেনে নেওয়া –– শ্রদ্ধা করা অত্যন্ত কঠিন––গোঁড়া ধার্মিকদের পক্ষে তা প্রায় অসম্ভব। ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার বীজও নিহিত এখানে । ... ধর্মগ্রন্থ ও তার বাহক তথা নবী পয়গম্বরদের আদেশ নির্দেশ ––আধুনিকতার মানদণ্ডে তা যতই অসঙ্গতিপূর্ণ হউক––সে অনুসারে আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক–রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ বিশ্বাস বা ধারণাই হলো ধর্মীয় মৌলবাদ। সুতরাং ধর্মীয় বিশ্বাসই হলো ধর্মীয় মৌলবাদের আদি উৎস-ভূমি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতারও সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ...

<u>মৌলবাদের মুল উৎসভূমি:</u>

মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সর্বাগ্রে তার মুল উৎসভূমি সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। একথা বলাই বাহুল্য–মুলতঃ ধর্মই হলো ধর্মীয় মৌলবাদের উৎসভূমি। পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা ১০০৯টি এবং কোন ধর্মই তার শ্রেষ্টত্বের দাবী পরিহার করেনি। প্রত্যেক ধর্মের দাবী হলো–সে ধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম–শ্রেষ্ট ধর্ম। তার বাস্তব কারণ হলো–কোন ধর্ম অন্য ধর্মের সঠিকত্ব স্বীকার করলে সে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আর থাকেনা। মজার ব্যাপার হলো, যে সকল ধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আর যে সকল ধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা (বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম) – তারা সকলেই পরস্পর বিরোধী। ইসলাম ধর্মে ইহুদী নাসেরাদের সাথে বন্ধুত্ব পর্যন্ত করতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সে কারণে একজন সত্যিকার ধার্মিকে অন্য ধর্মকে সহ্য করা– তাকে মেনে নেওয়া –– শ্রদ্ধা করা অত্যন্ত কঠিন––গোঁড়া ধার্মিকদের পক্ষে তা প্রায় অসম্ভব। ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার বীজও নিহিত এখানে । তাই সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতার মধ্যকার পার্থক্য রেখাটি অত্যন্ত ক্ষীণ। নিজ ধর্মে বিশ্বাস রাখা এবং একই সাথে অসাম্প্রদায়িক উদার ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হওয়া সুকঠিন বৈকি। কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্মগুলো তাদের ধর্মীয় গ্রন্থকে ঐশী বাণী রূপেই বিশ্বাস করে এবং তাদের ধর্মগ্রন্থকে পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে দাবী করে। যেহেতু তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকে ঈশ্বরের বাণী মনে করেন, সেহেতু এ বাণী তাদের কাছে চুড়ান্ত এবং নির্ভুল। নিরীশ্বরবাদী ধর্মগুলোও তাদের ধর্মবেত্তাদের বাণীকে সমভাবে নির্ভুল ও অলঙ্ঘনীয় মনে করেন। তাই ধার্মিক লোকেরা বিশ্বাস করেন––ধর্মীয় গুরু-যাযক-পুরোহিত-মোল্লারা যা সদম্ভে প্রচার করে থাকেন – একমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই তাদের ইহকাল ও পরকালের সার্বিক মুক্তি নিহিত এবং তা যথার্থভাবে অনুসরণ না করার কারণেই আজ আমাদের যত ইহজাগতিক বালা-মুসিবত। যেহেতু ধর্মবিশ্বাসী মাত্রেই বিশ্বাস করেন––তাদের ধর্মগ্রন্থ ঐশী বাণী, সেহেতু তা কখনো ভুল হতে পারেনা এবং তাকে সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জন করার এখতিয়ার কোন মানুষের নেই। অতএব ধর্মগ্রন্থ ও তার বাহক তথা নবী পয়গম্বরদের আদেশ নির্দেশ ––আধুনিকতার মানদণ্ডে তা যতই অসঙ্গতিপূর্ণ হউক––সে অনুসারে আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক–রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ বিশ্বাস বা ধারণাই হলো ধর্মীয় মৌলবাদ। সুতরাং ধর্মীয় বিশ্বাসই হলো ধর্মীয় মৌলবাদের আদি উৎস-ভূমি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতারও সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

মৌলবাদ কেন বিপজ্জনক?

প্রত্যেক ধর্মের মৌলবাদীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো––তারা তাদের ধর্মের মৌলিক বিধি-বিধানকে সমাজ ও রাষ্ট্রে অবিকলভাবে প্রয়োগ করতে চায়। তারা রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল দিগনির্দেশনার জন্য ধর্মের আদিম ধারণা বা বিধি-বিধানকে অনুসরণ করে। মুসলিম মৌলবাদীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের তাবৎ সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ কুরআন ও সুন্নাহের উপর নির্ভর করতে চায়। কুরআন যেহেতু ঐশী গ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ(দঃ) আল্লহের প্রেরিত পুরুষ, সেহেতু কুরআন ও সুন্নাহের (নবীর জীবনাচরণ) বাহিরে কোন দিগনির্দেশনা মুসলমানেরা মানতে নারাজ। ইহুদী মৌলবাদীরা তোরাহ্ এর আক্ষরিক ব্যাখ্যার বাইরে বিন্দু-বিসর্গ যেতে প্রস্তুত নয়। খৃষ্টান মৌলবাদীরা প্রায় সকল প্রশ্নে বাইবেলের শিক্ষা অভ্রান্ত বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। সাধারণভাবে সকল ধর্মের মৌলবাদীরা, প্রাণীজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি-রহস্য (*Cosmology & Anthropology*) নিয়ে তাদের স্ব স্ব ধর্মের ব্যাখ্যাকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে–যদিও ধর্মগ্রন্থগুলোর এ ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী। মৌলবাদীদের এ ধারণা যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়, তখন রাষ্ট্র পরিচালনায় সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ–এমনকি বৈজ্ঞানিক-যুক্তিনির্ভর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও কোন সুযোগ থাকেনা। সবকিছু যেহেতু ধর্মের আদি নির্দেশ অনুসারে করতে হবে, সেহেতু এখানে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রাহ্য করা যেতে পারে। তাই ধর্মভিত্তিক বৃহৎ রাজনৈতিক দল " জামায়াতে ইসলামী বাঙলাদেশ" এর জন্মদাতা মওলানা মওদুদী পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। ইরানী বিপ্লবের নেতা আয়তুল্লাহ খোমেনি ইসলামী ব্যবস্থাকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিপরীত প্রপঞ্চ (অহঃর-ঃযবংরং) বলে উল্লেখ করেছেন। গণতন্ত্রের বদলে স্বেচ্ছাচার, মত প্রকাশের স্বাধীনতার বদলে বাক স্বাধীনতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে নাগরিক অংশ গ্রহণের বদলে সে সুযোগের সংকোচন– এ সবই মৌলবাদী প্রশাসনের অন্তর্গত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেহেতু শুধুমাত্র ধর্ম-নির্দেশিত অনুশাসন প্রবর্তন করতে হবে, সেহেতু এসব নিয়ে বিতর্ক বা ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগও সেখানে থাকেনা। আইন বা নৈতিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার/যোগ্যতা শুধুমাত্র ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিরাই রাখেন, ফলে অন্য কারো মত গ্রহণের প্রশ্নই ওঠেনা। খোমেনি তার " কাসাফ আসরার" গ্রন্থে ধর্মশাস্ত্রের গুঢ়ার্থ উদ্ধারের চেষ্টার বিরুদ্ধে সাবধান করে বলেছেন– একমাত্র তারাই এর অর্থ বুঝতে পারবে, যারা আরবী ভাষায় বিজ্ঞ, বার ঈমামের শিক্ষার সাথে সুপরিচিত ও ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়নে সুদীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। তাহলে ধর্মের যতই উদারনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া হউক না কেন, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কখনো (আধুনিক) গণতান্ত্রিক হতে পারেনা। তাই যারা ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা বলেন, আবার জোটবদ্ধ নির্বাচন করে পশ্চিমা গণতন্ত্রের সুফল হিসাবে ক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন, তাদের চরিত্রের স্ববিরোধীতা অত্যন্ত পরিস্কার। পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র আছে, যাদের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো মুসলমান। সে অর্থে তারা মুসলিম রাষ্ট্র। তাদের মধ্যে কোন রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল হিসাবে ধরতে গেলে সৌদি আরবকেই সর্বাগ্রে বিবেচনায় নিতে হয়। মাটির নীচে অগাধ তেল সম্পদের কারণে সে দেশ আজ একটি ধনী দেশ হলেও তার আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি কেমন? যুগ যুগ ধরে সে দেশে শরিয়া আইনের নামে চলছে বাদশা শেখ আব্দুল আজিজ এর একটি গোষ্ঠীতান্ত্রিক পারিবারিক শাসন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর সর্বত্রই একটি পরিবারের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্র পরিচালনায় সে দেশের জনগণের বিন্দুমাত্র অংশগ্রহণ নেই। সে দেশের অগাধ সম্পদ লুঠেপুটে খাচ্ছে তারা। আর তাদের তখ্ত-তাউসকে নিরাপদ করার জন্য তারা পদলেহন করছে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের– যারা লুঠে নিচ্ছে তাদের তেল সম্পদ। চুরি করলে প্রকাশ্যে হাত কেটে ফেলা, আর বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের জন্য কোমর-সমান মাটিতে পুঁতে প্রকাশ্যে পাথর ছুঁড়ে মারাসহ একটি মধ্যযুগীয় বিচার ব্যবস্থা সে দেশে প্রচলিত–যেখানে আধুনিক বিচার পদ্ধতি অনুপস্থিত।

মানুষের বাক-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সর্বোপরি মানবাধিকারের বালাই নেই। পেট্রোডলারের বদৌলতে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল সুফল তলানীশুদ্ধ ভোগ করে অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন যাপন করলেও আরবী শেখরা সামাজিক ভাবে আকঁড়ে ধরে রেখেছে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারনা ও মুল্যবোধকে–কেবল আপামর জনগণকে ঠকানোর জন্য। সর্বাপেক্ষা নিগৃহীত সে দেশের নারী সমাজ–যারা বস্তুতঃ এখনো অবরোধবাসিনী। তবুও প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত অঢেল তেল সম্স্লদ তাদের জনগণকে দারিদ্র থেকে রক্ষা করেছে। অপরাপর আরব দেশগুলোর অবস্থা ও তদ্রূপ। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আফগানিস্থানের তালেবান রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ-ভীবৎস। এখন প্রশ্ন হলো–আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আমরা এরকম মধ্যযুগীয় অবস্থায় নিয়ে যেতে চাই কিনা। নিলে আমাদের সার্বিক সমস্যার সমাধান হতে পারে কিনা।

আমাদের রাষ্ট্রের মৌলিক সমস্যাটা কি?

আমাদের দেশ এখন কোন ঔপনিবেশিক শাসকের করতলগত নহে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন দশক পুর্বে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছি। কিন্তু ভৌগোলিক এ স্বাধীনতাকে সার্বিক অর্থে অর্থবহ করার জন্য যে আর্থ-সামাজিক মুক্তি, তা আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি। সে আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জনে আমাদের যা করতে হবে––প্রথমতঃ সমাজের প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকতে হলে যে ন্যুনতম অর্থনৈতিক সঙ্গতির প্রয়োজন, তার নিশ্চয়তার জন্য প্রত্যেক পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই মানুষের পাঁচটি মৌলিক মানবাধিকার–অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান অর্জনের পথ সুগম করবে। অতঃপর সমাজে মানুষের মত প্রকাশের অধিকার––একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা নিশ্চিত হবে। আইনের শাসন––প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি আধুনিক বিচার ব্যবস্থা যার অপরিহার্য পুর্বশর্ত। কিন্তু উপরোক্ত কোন শর্তই ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে সম্স্লর্কিত নয়। অধিকন্তু ধর্মীয় শাসনের নামে মৌলবাদীরা যে ব্যবস্থা চালু করতে চাচ্ছে সে ব্যবস্থায় আর যাই থাকুক, মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে পারেনা, থাকতে পারেনা আধুনিক বিচার ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটি ইহজাগতিক– অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথেই সংশ্লিষ্ট– কোন ধর্মীয় বিধিব্যস্থার সাথে সম্স্লর্কিত নয়। তাই সমস্যাটি ধর্মের নয়, সমস্যাটি রাজনৈতিক-অর্থনীতির। স্মর্তব্য যে, ইসলামী শরিয়া আইন কায়েম করলে উপরোক্ত সমস্যাগুলো যদি সমাধান হোয়ে যেত, তাহলে পাকিস্তানে বিগত ৮০ এর দশক থেকেই সে শরিয়া আইন ও হুদুদ আইন চালু আছে এবং পাকিস্তানকে সাংবিধানিকভাবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছে সে ৬০ এর দশক তথা বাঙলাদেশের জন্মের পুর্ব থেকেই। কিন্তু পাকিস্তানের মানুষ কি আর্থ-সামাজিক মুক্তির সন্ধান পেয়েছে? তাছাড়া ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ইতিহাস কী বলে। বেদনাদায়ক সত্য হলো পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি আজ একটি সামরিক আমলা শাসিত ধর্মভিত্তিক ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদঃ মৌলবাদের হিংস্ররূপ।

মৌলবাদ বাংলাদেশে জঙ্গীরূপ ধারণ করেছে–বিগত ১৭ই আগস্ট, ০৫ সালে একই সাথে ৬৩টি জেলায় বোমাবাজি– ধারণাটিকে তর্কাতীত করে তুলেছে। পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে দু'জন বিচারকসহ বেশ কয়েকজন আইনজীবি ও নিরীহ মানুষ মারা গেছেন। ইতিপুর্বে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের সাথে গাঁটছড়া-বাঁধা বর্তমান জোট সরকার দৃঢ়তার সাথে দেশে মৌলবাদী কোন শক্তির অস্থিত্বই অস্বীকার করেছেন ।জঙ্গী তৎপরতার সংবাদ পরিবেশনের জন্য উল্টা বিরোধী দল ও সংবাদ মাধ্যমকে দায়ী করেছেন––দেশের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াসের অভিযোগ তুলে। কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার ও

বিদেশী সাংবাদিককে বহিস্কার করেছেন। 'বাঙলা ভাই'- 'ইংরেজী ভাই' নামে কেউ নেই বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারংবার তার 'বার্ংলিশ' ভাষায় গলাবাজি করেছেন। কিন্তু আজ মৌলবাদ যখন জঙ্গীরূপে আবির্ভুত হয়ে জাতীয় নিরাপত্তাকেই হুমকীর মুখোমুখী করেছে তখন কর্তাব্যক্তিরা বোল পাল্টিয়ে বলতে চেষ্টা করছেন–এটা একটা গ্লোবাল সমস্যা। মৌলবাদের উত্থানকে অস্বীকার করে–প্রকারান্তরে তাকে প্রশয় দিয়ে–যে অন্যায় বর্তমান জোট সরকার করেছেন, তার ছেয়ে গুরুতর অন্যায় তারা করে চলেছেন অপরাধীদের না ধরে ––বিরোধী দলের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে– শূণ্যে তরবারি ঘুরিয়ে–জনগণের জীবনকে নিরাপত্তাহীন করে দিয়ে। আজকের ভীবৎস বাস্ত বতা হলো আমাদের রক্তমুল্যে কেনা প্রিয় স্বদেশভূমি আজ উগ্র-পশ্চাদপদ-মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারনায় বিশ্বাসী কতিপয় গোঁড়া ইসলাম ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত। তাদের প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে পৃষ্টপোষকতা করছে একাত্তুরের সে পরাজিত জামাত-শিবির চক্র।

ইতিহাসের নজিরবিহীন আত্মত্যাগের মাধ্যমে–একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জঠর ছিঁড়ে–নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জন্ম-নেওয়া একটি রাষ্ট্রে মৌলবাদের এ বিপজ্জনক উত্থান কিভাবে সম্ভব হলো? বাঙালি জাতির সমকালীন ইতিহাসের এটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বড় স্ববিরোধীতা (চধৎধফড়ী) । এ স্ববিরোধীতার ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত আছে একে রোখার সঠিক পথ ও পন্থার সন্ধান।

<u>মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ ।</u>

<u>রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঃ প্রেক্ষিত পাকিস্তান</u>

বাঙলাদেশে মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে পাকিস্তানে মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশের কার্যকারণ বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ–

প্রথমতঃ পাকিস্তানের জন্ম ধর্মীয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা। সে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশের দু'প্রান্তে অবস্থিত দু'টি মুসলিম প্রধান অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত হোয়েছিল পাকিস্তান (যদিও তা ছিল ঐতিহাসিক লাহের প্রস্তাবের পরিপন্থী) । আজকের বাঙলাদেশ ছিল সেদিনের পুর্বপাকিস্তান। তাই ১৯৪৭ ইং সালে জন্ম থেকে ১৯৭১ ইং সালে বাঙলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত দু'দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এক ও অভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ জন্মের পর হতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ, ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভুমিকা এবং সস্তা জনপ্রিয়তা ও ধর্মভীরু আমজনগণের ভোটের আশায় মৌলবাদী শক্তির সাথে মুলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর অপরিণামদর্শী আপোষকামীতা পাকিস্তানে মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশে যে ভুমিকা রেখেছে তার রাজনৈতিক ইতহাসের সাথে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অদ্ভুদ মিল রয়েছে।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র দাবী করলেও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বস্তুতঃ কোন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবক্তা ছিলেন না। তার স্বপ্ন ছিল মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত এক ভাষণে––যেখানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন––"আমরা একটি রাষ্ট্রের নাগরিক–এই প্রতিপাদ্য থেকেই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এটিকেই আমাদের আদর্শ হিসাবে সামনে রাখা প্রয়োজন এবং আপনরা দেখবেন <u>সময়ের ব্যবধানে হিন্দু আর হিন্দু থাকবেনা, মুসলমানেরাও মুসলমান থাকবেনা। ধর্মীয় অর্থে নয়। কারণ ধর্ম হলো মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্র। একটি জাতির নাগরিক হিসাবে তথা রাজনৈতিক অর্থে–– পাকিস্তানের</u>

নাগরিক হিসাবে" । তার এ বক্তব্য থেকে একথা স্সষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি পাকিস্তানকে মুলতঃ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। (যদিও তা অর্জনে তিনি ধর্মকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং যদিও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করে তাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস সোনার পাথরবাটির মত অবাস্তব) একইভাবে জিন্নাহের তিরোধানের পর পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খানও ছিলেন পশ্চিমা গণতন্ত্রের সমর্থক। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করলেও তারা কখনো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেননি। ধর্মভিত্তিক দলগুলো–বিশেষভাবে জামায়াতে ইসলাম ও মজলিশে আহরার এ ইসলাম– পাকিস্তান আন্দোলনেরই বিরোধীতা করেছিল। কিন্ত পাকিস্তান জন্মের অব্যবহিত পর তারা কীভাবে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক অঙ্গণে নিজেদের স্থান করে নেয়, সে ইতিহাস অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ ও চমকপ্রদ। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরোধীতার কারণে জামায়াতে ইসলামী ও মজলিশে আহরার এ ইসলাম প্রভৃতি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো পাকিস্তান জন্মের পর অত্যন্ত কোণঠাসা হোয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অঙ্গনে ফিরে আসার জন্য তাদের কোন ধর্মীয় নোতুন ইস্যুর প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় তারা 'কাদিয়ানীরা মুসলমান নহে' এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে-- এরকম একটি অবান্তর––সদ্যস্বাধীন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অগ্রগতির বিবেচনায়––সম্সুর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন-হাস্যস্সদ প্রসঙ্গকে সামনে নিয়ে আসে। ১৯৪৯ সালে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার দাবী করে মজলিশে আহরার এ ইসলাম কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার আহবান করে। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল জামায়াতে ইসলামী ও তাদের তাত্ত্বিক গুরু মৌলানা মওদুদী। তাদের প্রত্যক্ষ উস্কানীতে পাঞ্জাবে কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়–– দ্রুত লাহোরেও ছড়িয়ে পড়ে এ দাঙ্গা এবং তা ক্রমে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে থাকে। দীর্ঘ চার বছর ব্যাপী চলার পর ১৯৫৩ সালে দাঙ্গা এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে পাকিস্তান সরকার লাহোরে সামরিক শাসন জারী করতে বাধ্য হয়। এ দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। দাঙ্গার বিষয়ে তদন্ত ও বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হয়। আদালত বিচারে দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ উস্কানী প্রদানের জন্য মৌলানা মওদুদীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন– যা তার প্রাণভিক্ষা আবেদনের কারনে মওকুফ করা হোয়েছিল। সৌদী বাদশাহর অনুরোধে পরবর্তী সময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ভয়াবহ দাঙ্গা পরিস্থিতি সামরিক শাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের খুশী করার জন্য এবং ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর সমর্থনের আশায় পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খান পাকিস্তানের সংবিধানে "অবজেকটিভ রেজুলেশন" যুক্ত করলেন, যাতে বলা হল–পাকিস্তানের সংবিধানে কুরআন ও সুন্নাহের পরিপন্থী কোন ধারা থাকতে পারবেনা। পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র শব্দ কয়টি যোগ করা হল এবং সংবিধানের কুরআন ও সুন্নাহের পরিপন্থী কোন ধারা আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আলেমদের নিয়ে একটি ওলেমা পরিষদ গঠন করা হল। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খান মৌলবাদীদের সাথে এভাবে আপোষ করলেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্ম এভাবে নিজের স্থান করে নিল এবং মৌলবাদী ধর্মভিত্তিক দলগুলো এটাকে তাদের প্রাথমিক বিজয় ভেবে উল্লসিত হলো। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো––ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাথে আপোষ করেও লিয়াকত আলী খান ক্ষমতায় থাকতে পারলেননা। আততায়ীর নির্মম গুলির আঘাতে তাকে জীবন দিতে হয়েছে। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে অতঃপর যা চলতে লাগল তাহলো–– প্রাসাদ রাজনীতি--- ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র–– পর্দার অন্তরালে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও কিছু ক্ষমতান্ধ রাজনীতিকের ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে কামড়া-কামড়ি। ইস্কান্দর মীর্জা প্রেসিডেন্ট, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইউব খান প্রধানমন্ত্রী, অতঃপর মাত্র ৩০ মাসের মাথায় ইস্কান্দর মীর্জাকে তাড়িয়ে আইউব খানের ক্ষমতা অধিগ্রহণ––এসব পরিবর্তনের সাথে পাকিস্তানের আমজনগণের কোন সম্স্লর্ক ছিলনা, ছিলনা কোন আদর্শিক

দ্বন্দ্ব–এসব নিছক ক্ষমতার লড়াই। এমনকি জনগণ বুঝতেও পারতনা কোত্থেকে কি হচ্ছে। সব কিছু ঘটছিল পর্দার অন্তরালে। অন্দর মহলের মল্লযুদ্ধে সর্বশেষ বিজয়ী নটের গুরু জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানে ভাগ্যবিধাতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে। ক্ষমতা গ্রহণের পর বৃটিশভাবধারায় প্রশিক্ষিত জেনারেল আইয়ুব ১৯৬২ সালে তার ঘোষিত সংবিধানে পাকিস্তানের নাম থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র শব্দ কয়টি বাদ দিলেন, মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করলেন–– গোঁড়া মোল্লাদের কট্টর বিরোধীতা সত্ত্বেও–– মুসলিম পারিবারিক আইনে কিছু পরিবর্তন আনলেন। কিন্তু তার এ ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানও বেশী দিন টিকলনা। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারও সস্তা জনপ্রিয়তার প্রয়োজন অনুভত হলো এবং সে লক্ষ্যে কিছু দিনের মধ্যেই ১৯৬২ ইং সালের সংবিধানে আবারো সংশোধনী এনে ইসলামী প্রজাতন্ত্র শব্দ কয়টি যোগ করল। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বিষয় হলো–১৯৬৫ ইং সালে ফাতেমা জিন্নাহের বিরুদ্ধে নির্বাচন করতে গিয়ে এক শত আলেম থেকে ফতোয়া আদায় করল–– ইসলামী রাষ্ট্রে কোন মহিলা রাষ্ট্র-প্রধান হতে পারেনা। সকল বিরোধী দলের সমর্থন ও প্রচুর জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও মৌলিক গনতন্ত্রীদের ভুঁয়া চেক প্রদান সহ নানা কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয়ী হলো আইয়ুব খান। তার এ বিজয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মোল্লাদের অবস্থান আরো সুসংহত হলো। অবিভক্ত পাকিস্তানের পুর্বাঞ্চল সেদিনের পুর্বপাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলন দমিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানী শাসকেরা বরাবরই ধর্মকেই ব্যবহার করেছে। সর্বশেষ বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঠেকাতে গিয়ে যে গণহত্যা––নারী ধর্ষণ–এ সকল অপকর্ম তারা করেছে ধর্ম রক্ষার নামে। মাত্র ২৪ বৎসরের মধ্যে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার বিপদ সম্স্লর্কে–কী পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ কী সামরিক জান্তা–কেউ আদৌ কোন শিক্ষা নেয়নি। বরং সে বিপজ্জনক পথেই পাকিস্তানের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকল। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে নির্বাচনে জিতলেও জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্বৈরাচারী অপশাসন ও নির্বাচনে প্রচণ্ড কারচুপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোটবদ্ধ আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন ধর্মীয় দলগুলোকে হাতে নেওয়ার জন্য এবং আমজনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ভুট্টো কিছু শরীয়া আইন প্রণয়ন করলেন। ভুট্টোই প্রথমবারের মত জামায়তের দাবী মোতাবেক কাদিয়ানীদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা করলেন। ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল জিয়া––এতদিন ধরে পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা তিলে তিলে যে কাজটি করছিলেন––ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাথে আপোষ করে পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করা––তার ষোলকলা পুর্ণ করল। ভুট্টো কাদিয়ানীদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু ঘোষণা করেছিলেন, জিয়াউল হক তাদের অমুসলিম ঘোষণা করলেন। তাদের সরকারী চাকুরী থেকে অপসারণ করলেন। কাদিয়ানীদের মসজিদগুলো বন্ধ করে দিলেন। কাদিয়ানীদের আলাদা পরিচয় পত্র, তাদের জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা করা এবং দেশে হুদুদ আইন চালু করে শরীয়া আদালত গঠন করলেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহের স্বপ্নের বিপরীতে তার উত্তরসুরীরা পাকিস্তানকে একটি মধ্যযুগীয় ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করল। চুরি করলে হাত কেটে ফেলা, যৌন ব্যভিচারের জন্য মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে মারা, একজন পুরুষ সাক্ষীর বিপরীতে দু'জন নারী সাক্ষী হাজির করা–হুদুদ আইনের নামে সকল মধ্যযুগীয় আইন আজ পাকিস্তানে বিদ্যমান। মজার ব্যাপার হচ্ছে জিয়াউল হকের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমাভাবধারায় প্রশিক্ষিত বেনজির ভুট্টো ক্ষমতাসীন হলেও– হয়ে জিয়াউল হকের ইসলামীকরণের বিরুদ্ধে কোন সংস্কার পদক্ষেপই নেননি। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীণ নেওয়াজ শরীফ এর আমলেই তালেবানদের উত্থান। আজকের সামরিক শাসক মোশারফ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যতই হম্বিতম্বি করুক না কেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে–যেখানে রাষ্ট্রই মৌলবাদী– সেখানে ইসলামী মৌলবাদীদের কিভাবে রুখবেন তা আদৌ বোধগম্য নয়। তাই অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে মৌলবাদ আজ পাকিস্তানে শক্তিশালী। গত ২২শে জানুয়ারীর নিউইয়র্কস টাইমস এর এক প্রতিবেদনে লেখা হয়––আগগানিস্থানের সীমান্ত সংলগ্ন

একটি জেলায় বস্তুতঃ তালেবানদের শাসন চলছে। পাকিস্তানের প্রশাসন সেখানে মুলতঃ নিষ্ক্রিয়। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৫৯ বছর পরও পাকিস্তান একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারলইনা,

পক্ষান্তরে একটি ধর্মভিত্তিক সামরিক স্বৈরতন্ত্রই হলো আজকের পাকিস্তান––যার নিগড় থেকে বের হওয়ার জন্য একাত্তুরের বাঙালিদের মত লড়াই করছে বেলুচিস্তানের জনগণ–বেলুচ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ প্রেক্ষিত বাঙলাদেশ

ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রের জাতিগত শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এর ফলশ্রুতি আমাদের মাতৃভুমি বাংলাদেশ। সঙ্গত কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র আমাদের ৪ রাষ্ট্রীয় মুলনীতি হিসাবে সংবিধানে গৃহীত হয়। একটি স্বল্প-শিক্ষিত, দারিদ্রক্লিষ্ট জনগোষ্ঠির এ অর্জন ছিল বাস্তবিকই অভাবনীয়– যা পশ্চিমাবিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক অগ্রগতির মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের এ অর্জনের তাৎপর্য্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়না। তাই আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে দেখি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা দেওয়া শুরু করেন। অথচ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে– রাজাকার-আলবদর বাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে–তাদের নব্বই শতাংশের উপরে ছিল মাদ্রসার ছাত্র ও শিক্ষক। দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের একাধিক সভা-সমাবেশে দুঃখের সাথে কথাটি উল্লেখ করলেও তার সরকার ইসলামী ফাউণ্ডেশন সৃষ্টি করলেন। আজকে সে ইসলামী ফাউন্ডেশন মৌলবাদীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। তারপরও ১৯৭৫ ইং সাল পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতিমালা হিসাবে বহাল ছিল–ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ অবারিত ছিলনা। কিন্তু ১৯৭৫ ইং সালে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতাচ্যুত করে যারা ক্ষমতাসীন হলো তারা সর্বাগ্রে তাদের এ অপকর্মের বৈধতা দিতে জনগণের সামনে আবির্ভুত হলো ধর্মের আলখাল্লা পড়ে। এতবড় একটা জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে মাথায় কালোটুপি ও মুখে আল্লাহ ও রসুলের নাম নিয়ে মঞ্চে আবির্ভুত হলো খুণী মোস্তাক– প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিভু হিসাবে–ক্ষমতাসীন হয়েই যে তার পরিহিত কালো টুপিকে জাতীয় টুপি ঘোষণা করেছিল। এ প্রতিবিপ্লবের সুবিধাভোগী হিসাবে ক্ষমতাসীন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান দেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র মুছে দিল। নৃতাত্ত্বিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে নিয়ে আসল বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ। অর্থনৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে অধনবাদী বিকাশের পথ– যা সমকালীন উন্নয়নশীল দেশগুলেতে সঠিক উন্নয়ন কৌশল হিসাবে খুবই জনপ্রিয় ছিল– পরিহার করে ধনবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করল। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমার পরও সুনির্দিষ্ট অভিযোগে একাত্তুরের যে সকল যুদ্ধাপরাধী বিচারের অপেক্ষায় ছিল তাদেরও ক্ষমা করে দেওয়া হলো। জামাতে ইসলামী সহ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে ধর্মের নামে রাজনীতি করার লাইসেন্স ফিরিয়ে দিল। জামাতের আমীর যুদ্ধপরাধী গোলাম আজমকে দেশে এনে রাজনীতিতে পুর্নবাসিত করল। কতিপয় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ–বিশেষভাবে সৌদী আরবের আর্থিক সাহায্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী তাদের রাজনৈতিক প্রচারণা তীব্রতর করল– যার মুল লক্ষ্য হলো বাঙলাদেশের স্বাধীনতাকে ভুল প্রমাণ করা এবং বাঙলাদেশকে তথাকথিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর করা। পচাঁত্তরের পট পরিবর্তনের পর ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক বৈধতা আদায় ও আমজনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা শুরু করল পুর্ণোদ্যমে। মেজর জিয়া তার সকল বক্তব্য শুরু করার আগে প্রকাশ্যে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বলা শুরু করলেন। জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের পর

ক্ষমতাসীন খলনায়ক, তুলনাহীন দুশ্চরিত্র হোসেন মোঃ এরশাদ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দিলেন একই লক্ষ্যে-- তার সব অপকর্মকে বৈধতা দেওয়া। তিনি সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশটাকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দিলেন । ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের সাথে এরশাদ রাজনীতিতে পীরতন্ত্রের প্রবর্তন করে নোতুন মাত্রা যোগ করলেন । তিনি প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় হেলিকপ্টার ব্যবহার করে বিভিন্ন পীরের কাছে যেতে শুরু করলেন এবং এসব মুর্খ ও ভণ্ড বিভিন্ন পীরের উপদেশ প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রচার করতেন। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে এরশাদ এমন এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, যখন তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল, তখন তিনি প্রতি শুক্রবারে কোন না কোন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে যেতেনঅ মসজিদে গিয়ে তিনি পুর্বরাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হোয়ে সেই মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে এসেছেন বলে ডাহা মিথ্যা অবলিলায় বলে যেতেন; অথচ মানুষ জানত তিনি যাওয়ার দু'তিন দিন পুর্ব থেকেই সরকারী লোকেরা ঐ মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ও নিরাপত্তার কাজে লেগে থাকত। এরশাদের পতনের পর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনী কৌশল হিসাবে নগ্নভাবে ধর্ম ও ভারত বিরোধীতাকে কাজে লাগাল। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারে তারা এতটুকু গেল যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে ধর্ম চলে যাবে, মসজিদে মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলু ধ্বনি হবে–– দেশ ভারতের অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হবে– ইত্যাকার কথা জোরেশোরে বলে বেড়াতে লাগল । বলাবাহুল্য তারা এ অপকৌশলে সফল হয়ে নির্বাচনে জিতেছিল এবং ক্ষমতাসীন হোয়ে তারাও রাজনীতিতে–রাষ্ট্রীয় আচারানুষ্ঠানে– ধর্মের ব্যবহার বাড়িয়ে দিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ––সম্ভবতঃ ভোটের রাজনীতির বিবেচনায় এবং বিরোধী প্রচারণার জবাবে– তাদের রাজনৈতিক আচার আচরণেও ধার্মিকতা প্রদর্শণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। জয় বাঙলা শ্লোগানের সাথে তারা ও "লা-ইলাহা ইল্লালাহু–নৌকার মালিক তুই আল্লাহ"––প্রভৃতি শ্লোগান উচ্চারণ করতে লাগল। বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় বিভিন্ন উপনির্বাচনে বিএনপির সীমাহীন কারচুপি একটি দলীয় সরকারের অধীনে যে কোন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলল। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করল। সে আন্দোলন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ যুগপৎ কর্মসুচী গ্রহণ করল জামায়াতে ইসলামীর সাথে। আন্দোলনের মুখে প্রথমে বিএনপি একতরফা একটি নির্বাচন–অতঃপর সে নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন পাশ এবং সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি সরকারের সর্বাত্মক ব্যর্থতার পটভুমিতে আবারো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পটপরিবর্তন হলো। সুদীর্ঘদিন পর এবার ক্ষমতায় এলো মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে তত্ত্বধায়ক সরকারের আন্দোলন করতে গিয়ে জামায়াতের সাথে অঘোষিত ঐক্য করে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কী ক্ষতিটা আওয়ামী লীগ করেছে সে উপলব্ধি আওয়ামী নেতৃত্বের এখনো হয়েছে কিনা জানিনা। শুধু তা নয়, আওয়ামী লীগ ও তার রাজনৈতিক আচরণে এমন কিছু পরিবর্তন আনল যা প্রকারান্ত রে ধর্মীয় রাজনীতিকেই উৎসাহিত করল। দীর্ঘদিন পর ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনর্বাসনের তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগত গ্রহণ করলই না, বরং তাদের দলীয় কর্মসুচী এবং রাষ্ট্রীয় কর্মসুচীতে তারা ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুসরণ করতে শুরু করল পুর্ণোদ্যমে। সংসদে প্রত্যেক সাংসদদের মাথায় টুপি পরে বসা এবং যে কোন বক্তব্যের শুরুতেই জোর গলায় বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহিম বলা, কোন কিছুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে মোনাজাত করা, যে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলোয়াত করা, নেতা-নেত্রীর ফি বছর হজ্জ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় আচরণের সাথে রাজনৈতিক আচরণকে গুলিয়ে ফেলে অপরাপর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণের সাথে আওয়ামী লীগের আচরণের পার্থক্য নির্ণয় করা

দুরূহ হয়ে পড়েছিল–যা বস্তুতঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই বৈধতাই প্রদান করছিল। কিন্তু এত কিছু করেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেমন থাকতে পারলনা, তেমনি যে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর মনজয় করার জন্য আওয়ামী লীগ এতকিছু করলথ–তাদের মন থেকেও আওয়ামী লীগ সম্স্লর্কে নেতিবাচক ধারণা মুছে ফেলতে সক্ষম হলনা। প্রত্যুত্তরে জাতীয়তাবাদী দল আরো এক ধাপ এগিয়ে জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট নামক দলের সাথে জোট বেঁধে নির্বাচন করে আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। ক্ষমতাসীন হয়ে জোট সরকার ধর্মপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাঁধে তুলে দিল। ক্ষমতান্ধ হয়ে এ সামান্য বোধটুকু আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতারা হারিয়ে ফেলল যে, রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংগঠন–কোন সংগঠনের কোন ধর্ম থাকেনা। ধর্ম, তথা উপসনা-ধর্ম (ডড়ৎংযরঢ় জবষরমরড়হ) থাকে মানুষের––কোন বস্তু বা সংগঠনের নয়। বস্তু বা সংগঠনের ইহকাল পরকাল নেই। তারা স্বর্গ-নরকে যাবেনা। তাই তাদের ধর্মের প্রয়োজনও নেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম পালনের ফলে প্রকারান্তরে বৈধতা পেল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। এভাবে সেক্যুলার রাজনীতির শেকড় কাটা হতে লাগল একে একে। বলাবাহুল্য, কেবল ক্ষুদ্র বাম গণতান্ত্রিক দলগুলো –জনমনে যাদের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ–ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির শ্লোগান অব্যাহত রাখল। কিন্তু তাদের কণ্ঠের আওয়াজ আমজনগণ পর্যন্ত পৌছেনা। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্স্লষ্ট হয় যে, পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা যেভাবে ক্ষমতার স্বার্থে তিলে তিলে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন, ঠিক সে পথেই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন। তফাৎ শুধু এই যে, আমাদের জনগণের প্রতিরোধের মুখে সামরিক আমলা এদেশে পাকিস্তানের মত শেকড় বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাঃ

ধর্মীয় রাজনীতির জন্য উপরোক্ত উর্বর ভূমিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল পেট্রো-ডলার পেয়ে জামাতে ইসলামী ইতোমধ্যেই নিজেদের খুব সংগঠিত দল হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এতদ্বতীতও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, জামায়াতে মুজাহেদীন বাংলাদেশ–যাকে অনেকে জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র শাখা বলে মনে করে–হরকাতুল জিহাদ, খতমে নওবুয়াত আন্দোলন–জামাতে ইসলামী যাদের পৃষ্টপোষক– জিহাদ আন্দোলন প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর জন্ম হয়– যদিও তথাকথিত ইসলামী শাসনব্যবস্থার স্বরূপ নিয়ে তাদের মধ্যেও তীব্র মতবিরোধ বিদ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যের টাকায় ব্যাঙের ছাতার মত জন্ম হয় বিভিন্ন ইসলামী এনজিও–যাদের প্রধান কাজ হলো এসমস্ত ধর্মীয় দলগুলোকে পৃষ্টপোষকতা করা। এভাবে বিদেশী, বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের টাকায় উপরোক্ত রাজনৈতিক দলগুলো এদেশের সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে আল্লাহের দুনিয়ায় আল্লাহের শাসন কায়েমের জিগির তুলে দেশের বিশেষভাবে গ্রামের দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সমর্থকগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পেরেছে। এজন্য তারা বিশেষভাবে টার্গেট করেছে গ্রামের মাদ্রাশাগুলোকে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দ্রারিদ্রের সুযোগে তারা তাদের তরুণ ছেলেদের সহজে প্রলুদ্ধ করতে পারছে। নগর সভ্যতার বিকাশ ও পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার সীমাহীণ দারিদ্র ও পশ্চাদপদতা, শহরের সাথে গ্রামের বৈষম্য মৌলবাদী ধারণা প্রসারের জন্য উর্বর ক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ বাঙলাদেশ প্রেক্ষিত

মৌলবাদ প্রসারের আরো একটি মুল কারণ হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর সীমাহীন ব্যর্থতা। স্বাধীনতার দীর্ঘ তিন দশক পরেও আমাদের দেশে যেমন একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়নি, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানেও তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মুক্তবাজার

অর্থনীতিকে উন্নয়নের অব্যর্থ মডেল হিসাবে গ্রহণ করা হলেও দেশে কাঙ্খিত শিল্পায়ন ঘটেনি। ফলতঃ সমাজে যেমন শ্রেণী বৈষম্য তীব্র হোয়েছে তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য। উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন এক শ্রেণীর শহুরে লুঠেরা ধনিকদের সীমাহীন জৌলুস–আধুনিক জীবন যাপন–আর অন্যদিকে গ্রামের বিশাল দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রাণান্তকর আদি সংগ্রাম–এ স্ববিরোধী বৈশিষ্ঠমণ্ডিত কোন সমাজ কখনো স্থিতিশীল হতে পারেনা। বেকারের সংখ্যা তিন কোটির উপরে। ফি বছর ২১/২২ লক্ষ শিক্ষিত বেকার শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে। দুর্নীতি সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে পুরো সমাজকে গিলে ফেলেছে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের কলঙ্ক তিলক আমাদের মাতৃভুমির ভালে শোভা পাচ্ছে বিগত চার বছর ধরে। স্বাধীনতার পর হতে আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে আজ গ্রামীণ ও শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত দরিদ্র যুবশ্রেণীর মনে যে হতাশা দানা বেঁধেছে তাকেই সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাবার প্রয়াস পাচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো। আলজেরিয়া, মিশর ও তুরস্কের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলেও আমরা একই রকম চিত্র দেখতে পাব যে, সে সব দেশেও সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র দুরীকরণে মুল রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ব্যর্থতা মৌলবাদের উদ্ভব ও বিকাশের উর্বর ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছে। এহেন একটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাসীন চক্র মৌলবাদকে মোকাবেলার পরিবর্তে তাদের কর্মসুচীকেই আত্মীকরণ করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো কে কতটুকু ধার্মিক তা প্রমাণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা কারিকুলাম চালু করার পরিবর্তে তারা ধর্মীয় অনুশাসন নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্টপোষকতা করে চলেছে।

<u>রুখতে হবে মৌলবাদ</u>

মৌলবাদী শক্তিকে কেবল রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করে –একাত্তুরে যেমনটি আমরা করেছিলাম– রোখা যাবেনা। চুড়ান্তভাবে ঠেকাতে হলে তাকে রুখতে হবে আদর্শিকভাবে। ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠেছে মাদ্রাশা। শিক্ষান নামে যা ছড়ানো হচ্ছে তা মুলত ধর্মাশ্রয়ী কুপমণ্ডুতা ও অজ্ঞতা। অথচ মৌলবাদের প্রধান আশ্রয় হলো অজ্ঞতা। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার বিস্তার সে অজ্ঞানতা রোধে প্রধান ভুমিকা নিতে পারে। বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ঘটাবে ও তার লালন মৌলবাদী অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বর্ম হিসাবে কাজ করবে। এ লক্ষ্য অর্জনের প্রধান শর্ত হচ্ছে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিযুক্ত করা। মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করার জন্য সরকার যদি একের পর এক ধর্ম পালনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়, তাতে মৌলবাদের ভিত্তি কেবল শক্তই হবে। তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে সর্বাগ্রে আমাদের মৌলবাদী মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার অসারতা, অপ্রাঙ্গিকতা-পশ্চাদপদতা ও গণবিমুখতা তুলে ধরতে হবে আম জনগণের কাছে– বিশেষভাবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে। সেজন্য একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

মৌলবাদের মুল উৎস যেহেতু ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং এ গোঁড়ামীর উর্বরক্ষেত্র যেহেতু অশিক্ষা-কুশিক্ষা, সেহেতু তাকে রুখতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে শিক্ষা, বিশেষভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একই শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় আনতে হবে। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করতে হবে এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক কাঠামো, বেকারত্ব দুরীকরণ ও দারিদ্রবিমোচন, আইনের শাসন কায়েম, গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দুরীকরণ–বিশেষভাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন– ইত্যাদি আশু পদক্ষেপ মৌলবাদ উত্থানের বিরুদ্ধে বর্ম হিসাবে কাজ করবে। একটি

আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক, গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মৌলবাদসহ সকল কুসংস্কারের আগাছা ক্রমে শুকিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্রঃ

** ইসলাম, রাজনীতি এবং রাষ্ট্র–পাকিস্তান অভিজ্ঞতা-সম্পাদনা–আসগর খান*

** General in Politics- By-Asgar Khan*

** Religion in Global Politics- Jeff Haynes*

** Pakistan: Nationalism without a Nation—Edited by- Christophe Jaffrelot*

** Will Baluchistan Break Out of Pakistan ?*
Frédéric Grare-- January 31, 2006—Source --internet